Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৪১ বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৫ জানুয়ারি, ২০১৮, সোমবার, ১ মাঘ, ১৪২৪

ভাঙনের করাল গ্রাসে ১৫টি পাকা বাড়ি তলিয়ে গেল নদীগর্ভে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৮ জানুয়ারি : পশ্চিম তামাঘাট গ্রামে ১৫টি পাকা বাড়ি তলিয়ে গেল নদীগর্ভে। ভাঙন পরিদর্শন করলেন বিধায়ক প্রদীপকুমার সাহা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ- সেচ দপ্তরের গাফিলতিতে এই ভাঙন। সেচ দপ্তরের অবৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার জন্য অসহায় বাসিন্দাদের আজ মাথাগোঁজার ঠাঁই নেই, নেই সরকারি সাহায্য। পূর্বস্থলীর ২নং ব্লকের অন্তর্গত মাজিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম তামাঘাট ২নং সংসদে চলছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সেচ দপ্তরের ভাগীরথী নদীর ভাঙন প্রতিরোধের কাজ। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কাজের বিষয়ে অভিযোগ উঠেছে। পশ্চিম তামাঘাট গ্রামে বাসিন্দাদের অভিযোগ, নদীর স্রোত ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য সেচ দপ্তরের বাঁশের খাঁচা, পাথরের বদলে, নদীর অপর পাড় থেকে নৌকা করে পলিথিনের বস্তায় বালি ভরে নাইলনের দড়ি দিয়ে বেঁধে তা নদীর জলে ফেলা হচ্ছে। এতেই বিপত্তি। স্রোতের বিপরীতে কাজ করার ফলে তামাঘাট গ্রামে এই অকাল ভাঙন। বিদ্যুৎ দপ্তরের ২টি ইলেকট্রিক পোস্টও ডুবে গেছে। ১৫টি পাকা বাড়ি সম্পূর্ণভাবে নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ায় ওই পরিবারগুলি অসহায়, আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে প্রচণ্ড শীতের সময়। এছাড়া ১৩টি বসতবাড়ি ভাঙানের কিনারায় ঝুলছে। যে কোনো

—এরপর চারের পাতায়

বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে এক দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল ১৪ জানুয়ারি জাগরী হলে। সংস্থার দশম বর্ষপূর্তিতে এই কর্মশালায় জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত করা হয় গবেষক চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত ও যুগল মুখোপাধ্যায়কে। ইতিহাসচর্চার বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন স্থানীয় ইতিহাসচর্চাকারীরা।

পরিস্থিতি অনুযায়ী সংগঠন গড়ার আহ্বানে সম্পন্ন হল সিপিআই(এম) পশ্চিম বর্ধমান জেলার ২৪তম সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিকাশ চৌধুরী নগর, পারস তেওয়ারি নগর (জামুড়িয়া) : পরিস্থিতি অনুযায়ী সংগঠন গড়ার আহ্বানে সম্পন্ন হল সিপিআই(এম) পশ্চিম বর্ধমান জেলার ২৪তম সম্মেলন। ১১ জানুয়ারি প্রকাশ্য সমাবেশের মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়েছিল। প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক তথা পলিট ব্যুরোর সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্র, মহঃ সেলিম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী। সভায় সভাপতিত্ব করেন বংশগোপাল চৌধুরী। এদিন প্রতিনিধি সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দীপক দাশগুপ্ত। সাংগঠনিক রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করেন জেলা সম্পাদক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী। সম্মেলন উপলক্ষে জামুড়িয়ার নামকরণ হয়েছিল প্রয়াত শ্রমিক নেতা বিকাশ চৌধুরী ও পারস তেওয়ারি নামে। সম্মেলন মঞ্চ নজরুল ইসলাম-এর নামে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৩০৪ জন প্রতিনিধি ৯৩ জন দর্শক। রিপোর্টের উপরে ৫৬ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ। স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষে তাপস কবি। সমাপন বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, আমরা চার আক্রমণের মুখোমুখি, জীবন-জীবিকার উপর আক্রমণ, গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ, মেহনতি মানুষের ঐক্যের উপর আক্রমণ এবং সার্বভৌমত্বের উপর আক্রমণ। এই আক্রমণগুলিকে মোকাবিলা করার চার হাতিয়ার হলো মতাদর্শ, রাজনীতি, সংগঠন ও সংগ্রাম। এই চার হাতিয়ারকে একসাথে প্রয়োগ করতে হবে।

জবাবি ভাষণে গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী সংগঠন জোরদার আন্দোলনের উপর গুরুত্ব দেন। সম্মেলন থেকে ৬ জন বিশেষ আমন্ত্রিত ও ৫০ জনের নতুন জেলা কমিটি নির্বাচিত হয় গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী সম্পাদক পুনর্নির্বাচিত হন। প্রতিনিধিরা রাজ্য সম্মেলনের ১৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন দু'জন মৈনাক চ্যাটার্জী ও সংগীতা কোড়া (২৪)। প্রবীণ প্রতিনিধি ছিলেন বিনয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী (৭৬)। সম্মেলন থেকে লৌহ ইস্পাত শিল্পের সংকট, জেলার ধস গ্যাস আগুনের সমস্যা, বন্ধ কলকারখানা খোলার দাবি, তপশিলি জাতি উপজাতি অধিকার প্রতিষ্ঠা। জনবিরোধী এফ.আর.ডি.আই বিল বাতিল, ডিভিসি ও দুর্গাপুর ব্যারেজের সংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, কৃষি সংকট, ত্রিপুরা জনগণের প্রতি সংহতি সহ মোট ২১টি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সম্মেলন পরিচালনা করেন বিবেক চৌধুরী, বীরেশ মণ্ডল, জি. কে শ্রীবাস্তব, শান্তি মজুমদার ও নুরুল ইসলামকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিবেক চৌধুরী।

ভেঙ্গে দেওয়া শৌচাগার নতুন করে তৈরির দাবিতে মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১০ জানুয়ারি : মেমারি পুরসভা কর্তৃপক্ষ কমিউনিটি ল্যাট্রিন ভেঙ্গে দেওয়ায় ৩০০টি পরিবারকে বাধ্য হয়ে রেললাইন বা জি টি রোডের ধারে শৌচকর্ম সারতে হচ্ছে। অথচ মাত্র কয়েকদিন আগে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পূর্ব বর্ধমান জেলাকে নির্মল জেলা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মেমারি ১ এবং ২ ব্লককেও নির্মল ব্লক ঘোষণা করা হয়েছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাজ্যজুড়ে চলছে নির্মল বাংলা অভিযানের ঢাক। সংবাদসূত্রে প্রকাশ বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড সেই জায়গায় একটি মোটেল তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে। জায়গা খালি করার প্রয়োজনে এই ধ্বংসলীলা। মেমারি পুরসভার ৫নং ওয়ার্ডের মাউপাড়া সংলগ্ন এই এলাকায় ওই পরিবারগুলি বিগত ৪০ বছর ধরে বসবাস করছেন। বামফ্রন্টের সময়ে এই পরিবারগুলির জন্য একটি কমিউনিটি পায়খানা তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান পুরবোর্ডের পুরপতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মোটেল তৈরির কাজ শুরু হওয়ার আগে অন্য জায়গায় এদের পায়খানা তৈরি করে দেওয়া হবে। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। মাঠপাড়ার ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করে জে সি বি মেশিন দিয়ে পুরো জায়গা সাফ করা হয়েছে। নির্মল বাংলা প্রচারে প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতো মেমারি পুরসভার উদ্যোগে কমিউনিটি ল্যাট্রিন ভেঙ্গে দেওয়া হল। এলাকার গরিব পরিবারগুলির সদস্য আরতি কর্মকার, সুমিত্রা রায়, মঞ্জু ক্ষেত্রপাল, পূর্ণিমা রায়, পরাণ রায়, কার্তিক দাস, অমর ক্ষেত্রপাল, দিলীপ রায় জানালেন, আমাদের মেয়েরা সমস্যায় পড়েছে, সমাধানের জন্য চেয়ারম্যান প্রতিশ্রুতি দিয়েও কথা রাখলেন না। বর্তমানে সমস্যার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। মহকুমা শাসককে পুরসভার বিভিন্ন দুর্নীতি এবং শৌচাগার তৈরির দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

১০ জানুয়ারি মসাগ্রামে আলু পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন পূর্ব বর্ধমানে জেলার আলু চাষিরা।

ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়েছে

চঞ্চল উকিল

সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় জ্বলজ্বল করছে খবর শিরোনামে—সুপ্রিম কোর্টে বেনজির বিদ্রোহ! চার বিচারপতির নিশানায় দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এমন বেনজির ঘটনা নেই। অভিযোগের তুফান টিভি-র পর্দায় ঝড় তুলেছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে প্রশাসন ঠিক জায়গায় নেই। গত কয়েক মাসে অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে। প্রতিকার চেয়ে চার বিচারপতি একসঙ্গে প্রধান বিচারপতিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। প্রত্যাখ্যাত হয়েই তাঁরা এই পথ বেছে নিয়েছেন। তাঁরা দেশের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করতে চান, না হলে দেশের গণতন্ত্র বাঁচানো যাবে না। বিকল্প কোন পথ ছিল না, তাই তাঁদের প্রকাশ্যে এভাবে মুখ খোলা বেদনাদায়ক হলেও দেশ ও প্রতিষ্ঠানের কাছে দায়বদ্ধতার কারণে তাঁরা মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছেন।

ভারতের ৪৫তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের বহু আগে থেকেই বিচারপতি দীপক মিশ্রকে নিয়ে বিতর্ক চলছে। এই বিদ্রোহ সেই বিতর্কের পরিণতি বলেই মনে হয়। জমি দুর্নীতি, এমনকি অরুণাচল প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কালিখো পুলের সুইসাইড নোটেও বিচারপতি মিশ্রের নামের উল্লেখ ছিল, যা নিয়ে পরবর্তীকালে কোনও তদন্ত হয়নি। প্রধান বিচারপতি হওয়ার পরও শ্রীমিশ্র একাধিক বিতর্কে জড়িয়েছেন। লুথরা মামলায় দুই বিচারপতির বেঞ্চের অধীনস্থ মামলা হঠাৎ করে হাতে নিয়ে আগের বেঞ্চের নির্দেশ বাতিল করে বিতর্কে জড়িয়েছে বিচারপতি মিশ্রের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। তাঁর বিরুদ্ধে এরকম একাধিক অভিযোগ বারবার উঠে এসেছে সংবাদমাধ্যমে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা চাপাও পড়েছে। এদিন চার বিচারপতি প্রধানত প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর 'সুপিরিয়র' আচরণ নিয়ে। দু'মাস আগে তাঁরা একটি চিঠি লিখেছিলেন। এদিন সকালের ছোট্ট একটি সাক্ষাৎকার। তারপরই তীব্র এই বিস্ফোরণ।

সারা দেশকে চমকে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের চার সিনিয়র বিচারপতি অভূতপূর্ব ভাবে এদিন কাঠগড়ায় তুলেছেন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রকে। তাঁদের অভিযোগ, সাম্প্রতিক অতীতে তিনি অনেক নিয়মবর্হিভূত কাজ করেছেন, যার ফলে দেশের এই শক্তিশালী স্তম্ভ তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। তাই তাঁরা অনন্যোপায় হয়ে সংবাদমাধ্যমকে সব কিছু জানাতে বাধ্য হয়েছেন। দেশের 'গণতন্ত্র বিপন্ন', স্পষ্ট হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।

বিচারপতি জে চেলমেশ্বর— প্রধান বিচারপতির পরেই সবচেয়ে বরিষ্ঠ। গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তথ্য প্রযুক্তি আইনের বিতর্কিত ৬৬ক ধারা বাতিল, আধার ছাড়াই নাগরিকদের মৌলিক পরিষেবা পাওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন। বিচারপতি রঞ্জন গোগই-এর পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হওয়ার কথা। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি নির্বাচনী সংস্কার রায় দিয়েছিলেন, যার ফলে প্রার্থীদের সম্পত্তি ও অতীত মামলার ঘোষণা বাধ্যতামূলক হয়। বিচারপতি কুরিয়ান যোশেফ— হিমাচল প্রদেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি তিন তালাক মামলার বেঞ্চে ছিলেন। বর্তমানে কয়লা বন্টন মামলার বেঞ্চে রয়েছেন। বিচারপতি মদন বি লোকুর— অন্ধ্র প্রদেশ

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১৫ জানুয়ারি, ২০১৮

সন্দেহ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে

বাবার মৃত্যু যে স্বাভাবিক নয় সন্দেহ ছিলই। কিন্তু এখন আর তা নেই! মৃত বিচারপতি ব্রিজমোহন হরিকিষণ লোয়ার পুত্র অনুজ মুম্বাইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কাতর অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, আমাদের পরিবারকে বাবার মৃত্যু সম্পর্কে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ বন্ধ হোক। ছলছল চোখে আইনের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অনুজ লোয়া সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এখন আর কারও বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই।

কী সাংঘাতিক কথা! আইনজীবী এবং দেশের শীর্ষ আদালতের প্রবীণ বিচারপতিরাও যে বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন, যে বিষয়টি আজ সারা দেশের মানুষের সামনে জলের মতো পরিষ্কার! দেশের শীর্ষ আদালতে সাম্প্রতিক বেনজির চাপানউতোর সোহরাবুদ্দিন ভুয়ো সংঘর্ষ মামলায় সি বি আই-র বিশেষ বিচারপতি লোয়ার মৃত্যু-র ঘটনাকে সামনে এনে দিয়েছে, যা চর্চিত বিষয় সেই ঘটনা সম্পর্কে মৃত বিচারপতির পুত্রের কাতর আবেদন!

২০১৪-র ১ ডিসেম্বর নাগপুরে মৃত্যু হয় বিচারপতি লোয়ার। এক সহকর্মীর মেয়ের বিয়েতে তিনি নাগপুরে গিয়েছিলেন। প্রশাসনিক বক্তব্য ছিল, বিয়ের অনুষ্ঠানের পর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন তিনি। কিন্তু গতবছর সংবাদমাধ্যমে বিচারপতি হরিকিষেণ লোয়ার দুই কন্যা অনুরাধা বিয়ানি ও সবিতা মানধানে বাবার মৃত্যুতে সন্দেহ প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে ভুয়ো সংঘর্ষের এই মামলার বিচারপতি ছিলেন বি এইচ লোয়া আর অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বি জে পি সভাপতি অমিত শাহ।

২০০৫ সালের ২৬ নভেম্বর সোহরাবুদ্দিন ও ২৮ নভেম্বর তাঁর স্ত্রী কৌসরবাঈকে গুজরাটের পুলিশ ভুয়ো সংঘর্ষের নামে গুলি করে হত্যা করে বলে অভিযোগ। এর ঠিক এক বছর পরেই সোহরাবুদ্দিনের সঙ্গী তুলসী প্রজাপতি খুন হন। অমিত শাহ ছিলেন তখন গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ২০১০ সালে এই ভুয়ো সংঘর্ষ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সি বি আই তদন্তের নির্দেশ দেয়। ২০১০-র জুলাইয়ে চার্জশিটে সি বি আই অমিত শাহকে অভিযুক্ত করে। অমিত শাহ গ্রেপ্তার হন। তিন মাস পরে গুজরাট হাইকোর্ট শাহকে জামিন দেয়। ২০১২ সালে সুপ্রিম কোর্ট এই মামলা মুম্বাই হাইকোর্টে স্থানান্তর করে। ২০১৪-র মে মাসে বি জে পি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হন। তারপর থেকেই এই মামলাকে ঘিরে একের পর এক ঘটনা ঘটতে থাকে। সমন সত্ত্বেও আদালতে হাজিরা না দেওয়া, বিচারপতি বদলি ইত্যাদি ইত্যাদি। উল্লেখ্য গত নভেম্বরেও বাবার মৃত্যু সম্পর্কে একবার মুখ খুলেছিলেন অনুজ লোয়া। বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুরের সঙ্গে দেখা করে জানিয়েছিলেন যে, ঘটনায় কারও বিরুদ্ধে পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ নেই। কাউকে সন্দেহও করা হচ্ছে না। অনুজের সাম্প্রতিক বক্তব্যে সংশ্লিষ্ট মহলে খুবই প্রভাবশালী অংশের চাপ রয়েছে কিনা এ সন্দেহ আরো ঘনিভূত হয়েছে।

ডি.ওয়াই.এফ.আই-এর কালনা শহর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে কালনা পৌরসভায় আন্তঃওয়ার্ড ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট শুরু হয়েছে ১২ জানুয়ারি।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ১ জানুয়ারি কোন কোন বিশ্বদিবস হিসেবে পালিত হয়?
২. ২ জানুয়ারি কোন বিশ্বদিবস?
৩. ৪ জানুয়ারি বিশ্বদিবস কী?
৪. ৬ জানুয়ারি কোন বিশ্বদিবস?
৫. প্রবাসী ভারতীয় দিবস কবে পালিত হয়?
৬. বিশ্বধর্ম দিবস কবে পালিত হয়?
৭. ১ জানুয়ারি পৃথিবীর কোন কোন দেশের স্বাধীনতা দিবস?
৮. তৈমুর লং কবে দিল্লি দখল করেন? তাঁর আসল নাম কী ছিল? কবে তাঁর মৃত্যু হয়?
৯. কালকা থেকে সিমলা ট্রয়ট্রেনে যাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ কবে ছাড়পত্র পেয়েছিল?
১০. কোচবিহার রাজ্য কবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পায়?
১১. কার কার নেতৃত্বে কবে কিউবা স্বাধীন ও প্রজাতন্ত্রী হয়?
১২. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'ভ্যানগার্ড'এর নাম পরিবর্তন করে কবে কী নাম রাখা হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ধর্ম ও সমাজ

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

একজন ধর্মীয় মহাপুরুষ হিসাবেই স্বামী বিবেকানন্দের প্রাথমিক পরিচিতি। কিন্তু ধর্মের আপাত ও তার অন্তর্নিহিত সত্য উন্মোচনের পাশাপাশি একজন প্রকৃত সমাজতাত্ত্বিকের মতোই তিনি ধর্মের সামাজিক ভূমিকা নির্ণয় ও তারই আলোকে ধর্মের নামে নানা বিকারের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এইখানেই তাঁর অনন্যতা ও সর্বকালীন প্রাসঙ্গিকতা। চিন্তার প্রগাঢ়তা ও কর্মের ব্যাপ্তিতে মাত্র ৩৯ বছরের জীবনে তিনি আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ শুধু নয়, সারা বিশ্বে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। ধর্মের যে-সব বিকৃতির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ও সক্রিয় হয়েছিলেন, আজও তা সমাজস্থিতি ও প্রগতিকে বিপন্ন থেকে বিপন্নতর করে তুলছে। এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাই বিবেকানন্দ তাঁর জন্মদিনে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রত্যেক ধর্মের সাধারণ দার্শনিক ভিত্তি হলেও সবকিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ-কথা বিবেকানন্দ মানেন না, কেননা তা হলে 'সকল বিজ্ঞানের অবসান' ঘটবে। (১০/৩৬) বিজ্ঞানের প্রশ্নে কোনো ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে গ্রহণের অযোগ্য বলে নাকচ করে দিয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ''প্রত্যেক ঘটনারই একটা কারণ থাকে। একমাত্র ঈশ্বরকেই সকল কার্য-কারণের বিধাতা বলিলে তিনি এক ভীষণ দুর্নীতিশীল ব্যক্তি হইয়া দাঁড়ান। ...অবিদ্যমান কারণ হইতে কোনো কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। আমি যদি আগুনে আঙুল দিই, সঙ্গে সঙ্গে উহার ফল ফলিবে—আঙুল পুড়িয়া যাইবে। আমি জানি আগুনের সহিত আঙুলের সংস্পর্শ-ক্রিয়াই হইল দাহের কারণ।'' (১০/৬৩) তাই অলৌকিক ঘটনা বলেও কিছু তিনি মানেননি। তাঁর কথায়, ''আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের এলাকার বাইরে আশ্চর্য অনেক কিছু ঘটিয়া তাকে সত্য, কিন্তু ওইগুলি কোন না কোন নিয়মের অধীন। আমাদের ধর্মের সহিত ঐগুলির কোনও সম্পর্ক নাই।'' (১০/৩৮) পাপ-পুণ্যের ধারণা সম্পর্কেও তাঁর দ্বিধাহীন উক্তি—''ভগবান্ একজন রাজা নন, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো এক কোণে বসিয়া মর্ত্যবাসী মানুষের কর্ম অনুযায়ী দণ্ড বা পুরস্কার বিধান করিতেছেন।'' (১০/৫৮) তাঁর বিশ্বাস, ''এমন এক সময় আসিবে, যখন মানুষ সত্যের উপলব্ধি করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিবে এবং বলিবে—আমি ঈশ্বর।'' (ঐ)

ধর্মের তিনটি স্তরের কথা বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছেন—সর্বোচ্চ দার্শনিক স্তর, স্থূল পৌরাণিক স্তর ও স্থূলতর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের স্তর। (৩/২৭৪-৭৫) দার্শনিক স্তরে সব ধর্মই সত্য, 'সব ধর্মই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে—একটি অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব'। পুরাণ বলতে বিবেকানন্দ বুঝিয়েছেন মহাপুরুষ বা বীরগণের জীবন, দেবতা উপদেবতা ও দেবমানবের নানা উপাখ্যান। এর মধ্যেই যারা ইতিহাস খুঁজতে যায়, তাদের সম্পর্কে বিবেকানন্দের বক্তব্য, তারা ইতিহাস ও পুরাণের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা-ই উপলব্ধি করতে পারে না। (৩/১৫২-৫৩) অতীতের ধর্মীয় নির্মাণ কখনও প্রকৃত ইতিহাস হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে না। ধর্মের স্থূলতর স্তরটি হল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের স্তর এবং এ সম্পর্কে বিবেকানন্দের বিরূপতা বিশেষভাবে সোচ্চার। এগুলি কুসংস্কার, যা ধর্মকে অধঃপতিত করে। অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান বলবৎ করে হিন্দু ধর্মগুরুরা ধর্মকে কোথায় টেনে নামিয়েছে তা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, ''আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের 'ছুৎমার্গ', খালি 'আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না।' হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু-হাজার বৎসর খালি বিচার করছে—ডান হাতে খাব, কি বাম হাতে; ডান দিক থেকে জল নেব, কি বাঁ দিক থেকে এবং ফট্ ফট্ স্বাহা, ক্রাং ক্রুং হুঁ হুঁ করে তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে?'' (৬/৪১১) পুরোহিততন্ত্র সম্পর্কে তাই তাঁর ক্রুদ্ধ ও শ্লেষাত্মক উক্তি—''দুষ্ট ও চতুর পুরুতরা যতসব অর্থহীন আচার ও ভাঁড়ামিগুলোকেই বেদের ও হিন্দুধর্মের সার বলে আমাদের শেখায়।'' (৬/৩৪) তাই তাঁর দ্বিধাহীন ঘোষণা, ''প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখনো শুধরোবে না। তাদের হৃদয়ের কখনো প্রসার হবে না।'' (৬/৩৫৯)

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে, শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর বিশ্ববন্দিত ঐতিহাসিক ভাষণে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ''সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর

পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এই সকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানব সমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত।'' (১/১০) ''সকল ধর্মেই একশ্রেণির লোক আছে যাহারা ধন্মোন্মাদ।'' (১০/৪৪) এরাই ''অপরকে স্বমতে আনিতে বাধ্য করিবার জন্য তরবারি পর্যন্ত গ্রহণ করে। অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধিরই মত এই গোঁড়ামিও একটি ভয়ানক ব্যাধি। মানুষের যতরকম প্রবৃত্তি আছে এই গোঁড়ামি তাদের সবগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে। ইহা দ্বারা ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হয়, স্নায়ুমণ্ডলী অতিশয় চঞ্চল হয়, এবং মানুষ ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র হইয়া উঠে।'' (৩/১৪২) তাঁর উপদেশ, ''আমরা যেন অপরের কর্তব্য বিচার করিতে গিয়া তাহাদেরই চোখ দিয়া দেখি। যেন অপর জাতির আচার ব্যবহার আমাদের নিজেদের মাপকাঠি দিয়া মাপিতে না যাই। আমি বিশ্বজগতের মাপকাঠি নই। আমাকে জগতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। সমগ্র জগৎ কখনও আমার ভাবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিবে না।'' (১/৮৮) ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে 'সকলের পক্ষে স্বীকার্য ও গ্রহণীয়' ধর্মের এক 'সার্বভৌম রূপ' (৩/১৫৪)-এর সন্ধান করেছিলেন বিবেকানন্দ। জাতীয় ঐক্যের সৌধ গড়ে তোলার জন্য তিনি বিভিন্ন ধর্মের দার্শনিক ও ব্যবহারিক স্তরের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলিকে নিয়ে এক মেলবন্ধন ঘটাবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় সমন্বয়ের বদলে ধর্মীয় মৌলবাদকেই জাতীয়তার ভিত্তি করে তুলতে ধর্মান্ধরা অতিতৎপর, এবং হিন্দু মৌলবাদীরা সেই অপকর্মে বিবেকানন্দের নামকে ধ্বনিত হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণেও কার্পণ্য করছে না।

ধর্মের সামাজিক ভূমিকার বিষয়টি বিবেকানন্দের ধর্মদর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। মানুষ ও তার সমাজকে বাদ দিয়ে কখনই তা ব্যোমমার্গে বিচরণ করেনি। এক শক্তিশালী মানবতাবাদের উপর তা প্রতিষ্ঠিত। যা সর্বমানবের কল্যাণ করে না, তাকে তিনি প্রকৃত ধর্ম বলেই মানতে চাননি। বহুরূপে সম্মুখে যে মানুষ তাকে ছেড়ে ঈশ্বর-সন্ধান বৃথা। 'জীবে সেবা করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'—বিবেকানন্দের এই বিখ্যাত বাণী কে না জানে! 'সমাজ থেকে ধর্মকে দূরে থাকবার নির্দেশ প্রচার' করার আহ্বান জানিয়ে বিবেকানন্দ দৃঢ় ভাষায় বলেন, ''সামাজিক বিধিনিয়ম প্রণয়নের কোন অধিকার ধর্মের নেই। তা থেকে দূরে থাকো। নিজেকে নিজের অধিকারের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখ... পুরোহিতের কী অধিকার আছে প্রত্যেকটি সামাজিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবার।'' (৪/৩০২-০৬) শুধুমাত্র ধর্ম খাইয়ে ''পুরোহিতশক্তি ও পরাধীনতা তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া নিষ্পেষিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারও মানুষ।'' (৬/৪১) তাই তিনি নিরাবরণ স্পষ্টতায় বলেন, ''যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরিবের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনো চেষ্টা হয় না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য!'' (৬/৪১২)

জাতিকাঠামোর নিম্নতম স্তর হিসাবে শূদ্ররা কী ভয়ানক নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''কেবল যাদের শারীরিক পরিশ্রমের উপর ব্রাহ্মণের প্রভাব, ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতা এবং বৈশ্যের অর্থ অধিগত করা সম্ভব হয়েছে, তাদেরই জন্য দয়ালু ভারত এই কোমল ব্যবস্থা করল : তার জিব কেটে দাও, তার মাংস ছিন্ন কর এবং এইরকম আর অনেক প্রকার শাস্তি বিধান।'' (৪/৩৯৯) এইভাবেই জাতিভেদ পরিণত হয়েছে এক নির্মমতম শোষণব্যবস্থায়। বুদ্ধধর্মকে বিবেকানন্দ 'জাতিভেদ ও পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম প্রচেষ্টা' হিসাবে দেখেছেন। (১০/১০৬) 'ভারতবর্ষের দরিদ্রগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এত বেশি কেন?' এই প্রশ্ন তুলে বিবেকানন্দ নিজেই তার উত্তর দিয়ে বলেন, ''একথা বলা মূর্খতা যে তরবারির সাহায্যে প্রজাদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল। আর সেইজন্য বাংলাদেশে, যেখানে জমিদারের বিশেষ সংখ্যাধিক্য, সেখানে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরই সংখ্যা বেশী।'' (৭/৩৫-৩৬)

জাতিভেদ ব্যবস্থার মতোই সমাজের অর্ধাংশ যে নারী তার অধিকার হরণকারী পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধেও বিবেকানন্দ যথেষ্ট সরব। তাঁর মতে, ''ভারতের অধঃপতন হল ভটচায-বামুনরা ব্রাহ্মণেতর জাতকে যখন বেদপাঠের অনধিকারী ব'লে নির্দেশ করলে, সেই সময় মেয়েদেরও সকল অধিকার কেড়ে নিলে। নতুবা বৈদিক যুগে... মৈত্রেয়ী গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া মেয়েরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করেছিলেন।'' (৯/২০০) চিকাগো ধর্মমহাসভার অধিবেশনকালেই নারীদের এক বিশেষ সভায় বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ''কোন জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি নারীদের প্রতি তার মনোভাব।... পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যই পূর্ণ নারীত্ব।'' (১/৩৬) তাই তাঁর বিখ্যাত উক্তি—''জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।'' (৭/১৯৮) আলমোড়া থেকে মিস নোবেল (নিবেদিতা)-কে ভারতে আহ্বান জানিয়ে এক চিঠিতে (২৯ জুলাই,

—এরপর চারের পাতায়

দেশ ও সমাজ

অশান্ত আসাম : চাই গণতান্ত্রিক উদ্যোগ

শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

আমাদের রাজ্যের সংবাদমাধ্যমে আসামের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বেশ কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে আসামের বাস্তব পরিস্থিতির কোনো খবরাখবর না নিয়েই নানা সভাসমিতিতে চড়া সুরে নানা মন্তব্য করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর এই মন্তব্যকে কেউ কেউ ভাবছেন, আসামের বঙ্গভাষী মানুষের স্বার্থেই বোধহয় তিনি একটি নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর উদ্দেশ্য আসামের বঙ্গভাষী মানুষ নয়। আসামের বঙ্গভাষী মানুষের স্বার্থের দোহাই দিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের সস্তা ভোট-রাজনীতির হিসেব নিকেশ করেছেন। যদি তাঁর হৃদয় আসামের বঙ্গভাষীদের জন্যে সত্যিই কাঁদত, তবে আরো আগেই যখন আজকের পরিস্থিতির সলতে পাকানো হচ্ছিল তখনই তাঁর দল লোকসভা ও রাজ্যসভায় তাদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারত।

আমাদের দেশে যে একটি জাতীয় নাগরিক পঞ্জি রয়েছে সেটা আমরা প্রায় কেউই জানি না। ১৯৫১ সালে তৈরি হওয়া জাতীয় নাগরিক পঞ্জিটির এই মুহূর্তে শুধুমাত্র আসামে নবীকরণ চলছে। এই গোটা প্রক্রিয়াটি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সংগঠিত হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হলেও যেহেতু বাস্তবায়ন করছে আসামের সরকারি প্রশাসন ফলে তাতে নানা সমস্যা রয়েছে। এই নাগরিক পঞ্জি নবীকরণের কাজটি ১৯৮৫ সালের আসাম চুক্তি বাস্তবায়নের অঙ্গ হিসেবে এই মুহূর্তে পরিচালিত হচ্ছে। আসামের রাজনীতি গত কয়েক দশক ধরে অস্থির হয়ে আছে এই বিতর্ক ঘিরে যে প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যায় বঙ্গভাষী মানুষের আগমণের ফলে আসামের জনসংখ্যার ভাষিক ভারসাম্যের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং এর ফলে অসমীয়া ভাষা, সংস্কৃতি সহ অসমীয়া সমাজের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বহিঃআসামের অনেকের ধারণা আসামে যে সমস্ত বঙ্গভাষী মানুষেরা রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেই হয়তো ১৯৪৭ সালের দেশভাগের ফলেই পূর্ববঙ্গ থেকে সেখানে গিয়েছেন। এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। আসামের অন্তত দু'টি অঞ্চল উনবিংশ শতকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের সিদ্ধান্তে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল। ফলে সেই অঞ্চলের বঙ্গভাষী মানুষ কোনো ধরনের অভিবাসন ছাড়াই আসামের জনসংখ্যায় যুক্ত হয়ে গেছেন। এছাড়াও উনবিংশ শতক থেকেই ব্রিটিশ প্রশাসনের উদ্যোগে পূর্ববঙ্গ থেকে আসামের চর অঞ্চলে বঙ্গভাষী মানুষের বসতি স্থাপন করা হয়েছিল। আসাম মানেই অসমীয়াভাষীদেরই একমাত্র বাসস্থান হিসেবে ধারণা করাটা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। আসামে বাঙালি ছাড়াও নানা ভাষাগোষ্ঠীর বাস।

অসমীয়া-বাঙালি বিরোধের ইতিহাস সম্পর্কে আভাস পেতে সাম্প্রতিক অতীত থেকে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। ১৯৭৮ সালে আসাম বিধানসভার নির্বাচনে

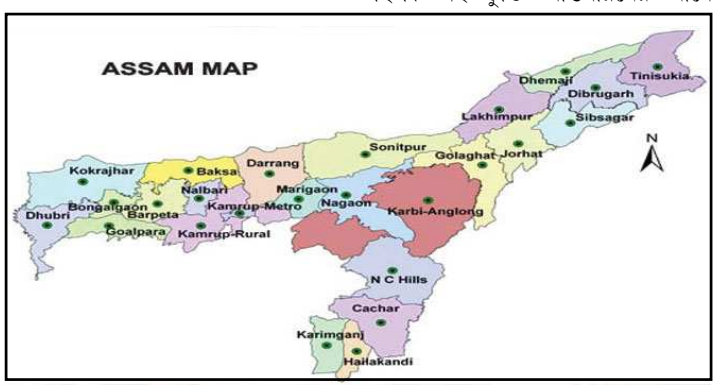

সিপিআই(এম) ১১টি আসন সহ বামপন্থীরা মোট ২৪টি আসন জয়লাভ করার পর, এই পর্বের ভাষিক রাজনীতির চক্রান্ত শুরু হয়। এই প্রথম ভাষাগত বিরোধের সাথে বামপন্থীদের প্রতি আক্রমণ যুক্ত হয়। এর পেছনে আনন্দবাজার পত্রিকার বরুণ সেনগুপ্তের নিবন্ধেরও একটি ভূমিকা ছিল। তিনি তাঁর 'রাজ্য রাজনীতি' কলামে লিখেছিলেন 'আসামে বামপন্থীদের অগ্রগতি মানে বাঙালিদের আধিপত্য বৃদ্ধি'। আনন্দবাজার পত্রিকার এই সংখ্যার গণবহ্ন্যুৎসব দিয়ে আসাম আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। একই সঙ্গে ভাষিক সংখ্যালঘুদের ওপর ও বামপন্থী অসমীয়া কর্মী, বিশেষ করে সিপিআই(এম) কর্মীদের ওপর আক্রমণ সংগঠিত হয়েছিল। প্রায় ৫০ জন সিপিআইএম কর্মী নিহত হন এই আক্রমণে। আসাম আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হয় কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আন্দোলনকারীদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে। আসাম চুক্তি নামে এই চুক্তিকে সামান্য বিরোধিতা সহ সিপিআই(এম) মেনে নেয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ রাত ১২টার পর বাংলাদেশে থেকে যারা ভারতে আসবেন তারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। যদিও বাদ পড়ে যাওয়া মানুষদের কী হবে এ নিয়ে আসাম চুক্তি নীরব ছিল। এই চুক্তি বাস্তবায়নের নামে বিগত কয়েক দশক ধরে নানা পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও ঘোষিত লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিকের বদলে মোটে ১৯,০০০ মানুষের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়। তার মধ্যে কয়েক হাজারকেই অবৈধ অনুপ্রবেশেকারী হিসেবে চিহ্নিত করে সরকার। এই বিদেশি বাছাইয়ের প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ এই অভিযোগ করে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল। সেই মামলার রায় দান করেই সুপ্রিম কোর্ট ১৯৫১ সালের জাতীয় নাগরিক পঞ্জির নবীকরণ করার নির্দেশ প্রদান করে। এই নাগরিক পঞ্জিতে প্রতিটি আবেদনকারীকে তার লিগ্যাসি ডাটা বা উত্তরাধিকার সূত্র দিতে হচ্ছে ১৯৬৬ সালের ভোটার তালিকা অথবা ১৯৫১ সালের জাতীয় নাগরিক পঞ্জির মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়াটিকে যতই অদ্ভুত মনে হোক এই মুহূর্তে এই নবীকরণের প্রক্রিয়াকে বিরোধিতা করার কোনো অবকাশ নেই। কারণ প্রতিটি জনগোষ্ঠী, সংগঠন ও দল এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছেন। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মানুষ এই পঞ্জিতে অন্তর্ভুক্তির জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। এই পঞ্জির প্রথম খসড়া নানা ত্রুটি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অংশের মানুষের নাম প্রথম খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই বাদ-পড়া মানুষের সিংহভাগ ভাষিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। এঁদের মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যাই বেশি। ভাষিক সংখ্যালঘু অঞ্চলে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যেহেতু বাদ পড়া মানুষের সংখ্যা এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। অসমীয়া অধ্যুষিত জেলায় যখন অন্তর্ভুক্তির হার কোথাও ৯০ শতাংশ, কোথাও ৮০ শতাংশ, তখন ভাষিক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বরাক উপত্যকায় অন্তর্ভুক্তির হার ২৯ শতাংশ। পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের একটি পদক্ষেপের ফলে। আসাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জি নবীকরণের বাইরে গিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী এনে রাজ্যের রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণে মদত জুগিয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে আসা মুসলিম ব্যতিরেকে অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষদের উপর থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর তকমা তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সাধারণভাবে মনে হবে এই আইনটি একটি মহৎ প্রস্তাব। প্রতিবেশী দেশের নির্যাতিত মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার উদ্দেশ্যেই হয়ত এই আইন। আসলে তা নয়। এই আইন রচনার গভীরে মুসলিম বিদ্বেষের রাজনীতিকে ঘৃতাহুতি দেওয়াই উদ্দেশ্য। শ্রীলঙ্কার নির্যাতিত তামিল বা মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের এই আইনের আওতায় রাখা হয়নি। কারণ শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমারে নির্যাতক রাষ্ট্রের শাসকদের ধর্মীয় পরিচয় মুসলিম নয়, বৌদ্ধ। মায়ানমার ছাড়া শ্রীলঙ্কাতেও মুসলিমরাও তামিলভাষী হিসেবে নির্যাতনের শিকার। প্রস্তাবিত এই আইন ভারতকে সারা পৃথিবীর হিন্দুদের স্বাভাবিক স্বভূমি হিসেবে প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে তৈরি। ইজরায়েলকে যেমন সারা পৃথিবীর ইহুদীদের স্বাভাবিক স্বভূমি ধরা হয়। প্রস্তাবিত এই আইন শুধু বাংলাদেশের বাঙালি হিন্দু অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে যেমন নয়, আবার প্রস্তাবিত এই আইনে কোথাও নাগরিকত্ব প্রদানের কথাও নেই। আসামে বিজেপি এই আইনকে বাংলাদেশের হিন্দুদের নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা বলে বাঙালি হিন্দুদের সংগঠিত করতে চাইছে। এই দাবিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উগ্র অসমীয়া সংগঠন ও সংবাদমাধ্যম এই আইনকে শুধু বাংলাদেশের বাঙালি হিন্দুদের নাগরিকত্ব প্রদানের চক্রান্ত হিসেবে অভিহিত করে বাঙালি বিরোধী জনমত গঠন করতে চাইছে। এটাও মিথ্যা। কারণ প্রস্তাবিত এই আইন শুধু বাংলাদেশ বিষয়ক নয়, নাগরিকত্ব প্রদানের নিশ্চয়তাও এতে নেই। এই আইন অগণতান্ত্রিক। কারণ যদি নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয় আসেও সেটাও অসাংবিধানিক। কারণ ভারতের সংবিধানে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদানের কোনো সুযোগ নেই। বিজেপি ছাড়া কোনো দলই এই আইনের সমর্থক নয়। এই মুহূর্তে বরাক উপত্যকায় এক ধরনের উগ্র বাঙালিত্বের মাধ্যমে এই বিষয়টি নিয়ে তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আসাম থেকে বারাক উপত্যকাকে আলাদা করে পৃথক রাজ্য গঠনের আওয়াজও উঠছে। পৃথক বরাকের দাবি বরাকের ভেতরে বাঙালি হিন্দু মুসলিম ও অন্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতের রাজনীতির পথ উন্মুক্ত করতে যাচ্ছে। আসামের জাতীয় নাগরিক পঞ্জির নবীকরণ প্রক্রিয়ার অন্তর্বস্তুতে বাঙালি-বৈরিতা আছে ঠিকই কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় সাধারণভাবে সব অসমীয়াকে নিপীড়ক ও সব বাঙালিকে নিপীড়িত এমন তত্ত্ব দেওয়া সম্ভব নয়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সূর্যসেনা মাস্টারদা

শিবানন্দ পাল

মৃত্যুই শেষ নয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানীদের বারবার আমরা স্মরণ করার সময় এই কথা মনে মনে উচ্চারণ করি আর খুঁজে বেড়াই সেই সব প্রশ্নের উত্তর—কেন তাঁরা সমাজ সংসার ফেলে এই কাজে জীবনের অসম সময়ে অসীম সাহসে নিজেদের জীবনকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। মাস্টারদা সূর্য সেন তেমনিই একজন বীর সেনানী।

১৯৩০-এর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের যুবদের এক অনন্য উৎসাহে জীবন বলিদানের সংকল্প তৈরি করে দিয়েছিল, যার ফলে ব্রিটিশরা ভাবতে বাধ্য হয় এদেশকে তারা বেশি দিন আর শাসন করতে পারবে না, স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থার মধ্যে যতদিন টিঁকে থাকা যায়, সেই ব্যবস্থাই কার্যকর করার পথ তারা নিয়েছিল। মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ের সেদিনের ওই ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। যে ঘটনায় শুধু তরুণ যুবরাই অদম্য উৎসাহে এগিয়ে এসেছিলেন তা নয়, তরুণীরাও সক্রিয়ভাবে হাজির ছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে যা চমকে দিয়েছিল। এর পিছনে ছিল ধারাবাহিক এক প্রক্রিয়া। বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজি নজরুল ইসলাম এবং আরো অনেকের দেশপ্রেমের বাণী রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তরুণ ভারতবর্ষ। মাস্টারদা সূর্য সেনদের মতো এমন কিছু সূর্যসেনানী নায়ক তাই মনে করেছিলেন দেশকে মুক্ত করতে প্রয়োজন সশস্ত্র সংগ্রাম। আর তাই হাতে অস্ত্র চাই।

হতচকিত বিদেশি শাসক সেদিন প্রথমে বুঝতেই পারেনি কতজন এই অভ্যুত্থানে জড়িত ছিল! তাঁরা সংখ্যায় ৫০০ না ১০০? এই ধন্দে সময় অতিবাহিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাটি ছিল মাত্র ৬৫। যাদের ৭০ শতাংশের বয়স ছিল ২০-র নিচে। একই সঙ্গে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং রেলওয়ে সংযোগের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে শহর মুক্ত করেছিলেন তাঁরা।

১৮৯৪ সালে সূর্য সেন-এর জন্ম। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর কলেজ থেকে স্নাতক হন। ১৯১৬সালে পুলিশ কলেজের হস্টেল তল্লাশি করে বুঝতে পারে তাঁর স্বদেশি কর্মকাণ্ড। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে স্বদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা তাঁকে 'মাস্টারদা' হিসেবে জনপ্রিয় করে তোলে। স্বদেশি আন্দোলনের ধারায় তিনি এরপর

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে এবং আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট সংগঠিত করেন। চৌরিচৌরা কংগ্রেসে স্বদেশি আন্দোলনের ধারা অহিংস না সহিংস পথে চলবে এ নিয়ে বিতর্ক দানা বাধলে মাস্টারদা বুঝতে পারেন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব সমঝোতার পথে চলতে প্রস্তুত, তাঁদের ভাবনা পৃথক। ১৯২৬-এ তাঁকে গ্রেপ্তার করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ পুলিশ। ১৯২৮সালে মুক্তি পান। মাস্টারদা মনস্থির করে ফেলেন স্বাধীনতার সংগ্রাম কোন পথে চলবে! তিনি অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবন উৎসর্গীকৃত তরুণদের নিয়ে পরিকল্পনা করলেন ব্রিটিশকে এমন আঘাত দিতে হবে যা সারা দেশে একটি উদাহরণ তৈরি করে। ১৯৩০-এর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সেই পরিকল্পনারই অংশ।

প্রথমে স্বাধীন প্রাদেশিক জাতীয় সরকারের ঘোষণা করে নিজেকে সভাপতি নির্বাচিত করেন। তৎকালীন কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু এ অবস্থায় তাঁকে গোপন জায়গায় স্থানান্তরিত করবার জন্য সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মাস্টারদা চট্টগ্রামেই তাঁর অবস্থান সুনিশ্চিত জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এখানেই আমি মরতে চাই! কিন্তু ১৯৩৩-এ তিনি ধরা পড়ে যান। প্রচণ্ড নির্যাতন চালানো হয় তাঁর উপরে। অকথ্য অত্যাচারেও তাঁর জীবন টিঁকে ছিল ১২ জানুয়ারি, ১৯৩৪ পর্যন্ত। ব্রিটিশ প্রশাসন এদিন তাঁকে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করে এবং চট্টগ্রামেই তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। তাঁর সঙ্গে একই দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয় তাঁর অনুরাগী তারকেশ্বর দস্তিদারেরও।

মাস্টারদা সূর্য সেন তাঁর অনুগামীদের শেষ চিঠি লিখেছিলেন ১১ জানুয়ারি, ১৯৩৪। তিনি লিখেছেন- "মৃত্যু এগিয়ে আসছে। আমি অসীমের দিকে ধাবিত হচ্ছি। ... এটাই সঠিক মুহূর্ত আমার প্রিয়বন্ধুদের আমি উপলব্ধি করছি। এমন সুখের পবিত্রতম মুহূর্তে কী আমি তোমাদের জন্য দিয়ে যাচ্ছি বন্ধু? শুধু একটাই জিনিষ, আমার স্বপ্ন, সোনালী স্বপ্ন- শৃঙ্খলহীন মুক্ত ভারত। হে সাথী, সামনে এগিয়ে চলো। কখনো যেন তোমার পা না টলে যায়। স্বাধীনতার সূর্যের আলো আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করছি। জয় আমাদের হবেই!"

দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সে দেশে আজ মোদীর জমানা চলছে। গেরুয়া রঙের আর এক ঔপনিবেশিক রাজ কায়েম হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের কাছে পদানত এই ভারত। এই ভারতকেও আজ মুক্ত করার শপথ নিতে হবে। তাই মাস্টারদা সূর্য সেনের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে স্মরণ করেই সেই শপথ আমাদের নিতে হবে।

সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্মেলনে প্রতিনিধিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি সম্মেলন মোট ৩৭৭ প্রতিনিধি, ২১ জন দর্শক, ৭ জন সম্মানীয় প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিদের মধ্যে পুরুষ ছিলেন ৩৩৭, মহিলা ৪০ জন। বিবাহিত ৩৪৮ ও অবিবাহিত ২৯ জন। বয়সের দিক থেকে ৩০ বছরের নীচে ১১, ৩১-৪০-এর মধ্যে ৩৪ জন, ৪১-৪৫ বছর ৪৪ জন, ৪৬-৬০ ১১৮ জন, ৭১-৭০ বছরের ৮৯ জন, ৭০ বছরের উর্ধ্বে ছিলেন ১১ জন। সবচেয়ে বয়স্ক প্রতিনিধি ছিলেন গৌরী ব্যানার্জী ও জয়দেব মুখার্জী বয়স ৭৭ বছর। সর্বকনিষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন অনির্বাণ রায়চৌধুরী ২২ বৎসর ৬ মাস। সর্বকনিষ্ঠ দর্শক ছিলেন মিজানুর রহিম ২৫ ও বয়স্ক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ সাধু ৬৭ বছর। প্রতিনিধিদের শিক্ষতগত যোগ্যতা নিরিখে ২জন প্রথা বহির্ভূত, প্রাথমিক ২ জন, অষ্টম শ্রেণি ৩৮ জন, মাধ্যমিক ১০০ জন, উচ্চ মাধ্যমিক ১২, স্নাতক ১৩৯, স্নাতকোত্তর ৫৫/, করিগরি ৬, অন্যান্য ২৩। মাতৃভাষার দিক থেকে বাংলা ৩৫৭, হিন্দি ৪, সাঁওতালি ১৬। তপঃজাতি ৪২, আদিবাসী ১৯, সংখ্যালঘু ৭৬ জন। সদস্যপদের নিরিখে ১৯৪৭-৬৩ মধ্যে ২জন, ১৯৬৪-৭৬ ৪২ জন, ১৯৭৭-৯১ ১৮২ জন, ১৯৯২-২০০৮ ১০৭, ২০০৯-১০—১৭ জন, ২০১১ পরবর্তী ২৭ জন। প্রতিনিধিদের মধ্যে ১৯৩ জন মিথ্যা মামলার আসামী হয়েছেন। ভাতারে নজরুল হক সর্বাধিক ৩৯টি মামলার আসামী হয়েছেন। সর্বোচ্চ আত্মগোপনে থেকেছেন দেবু রায়। প্রতিনিধিদের মধ্যে ৫৫ জন কারাবাস করেছেন। দর্শকদের মধ্যে ৪ জন মিথ্যা মামলায় আসামী হয়েছেন।

দুঃস্থদের টেস্ট পেপার বিলি কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ জানুয়ারি : এস.এফ.আই-এর কালনা ১নং লোকাল কমিটির উদ্যোগে কালনায় এক অনুষ্ঠানে ৫০ জন দুঃস্থ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীকে টেস্ট পেপার বিলি করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছাত্র-যুব ও শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

ছাত্রছাত্রীদের হাতে বইগুলি তুলে দেন সঞ্জিত ব্যানার্জী, অরুণাভ চক্রবর্তী, অনির্বাণ চৌধুরি, অরূপ দাস, রাধেশ্যাম দাস, নেপাল সরকার প্রমুখ। বক্তারা বলেন, শত আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনামুখী করে তুলতেই এই টেস্ট পেপার বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যা অভিনন্দনযোগ্য।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির নবনির্বাচিত সদস্যদের নামের তালিকা

বিশেষ আমন্ত্রিত

১) বামাপদ মুখার্জী
২) রথীন রায়
৩) তাপস রায়
৪) বিনয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী
৫) অশোক মুখার্জী
৬) সন্তোষ দেবরায়

১) গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী
২) বংশগোপাল চৌধুরী
৩) বিবেক চৌধুরী
৪) বীরেশ মণ্ডল
৫) পার্থ মুখার্জী
৬) জি. কে শ্রীবাস্তব
৭) দীপায়ন রায়
৮) অসীম ব্যানার্জী
৯) বিনয় হাঁসদা
১০) মনোজ দত্ত
১১) মহাব্রত কুণ্ডু
১২) মহাদেব পাল
১৩) বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী
১৪) অলোক ভট্টাচার্য
১৫) রুনু দত্ত
১৬) প্রবীর মণ্ডল
১৭) সুবীর সেনগুপ্ত
১৮) শিশির ঘোষ
১৯) নির্মল ভট্টাচার্য
২০) নুরুল ইসলাম
২১) সুজিত ভট্টাচার্য
২২) মনোজ দাস
২৩) পঙ্কজ রায়সরকার
২৪) শান্তি মজুমদার
২৫) মনোজ মুখার্জী
২৬) রাকেশ শর্মা
২৭) শ্যামা ঘোষ
২৮) বিশ্বরূপ ব্যানার্জী
২৯) সুপ্রিয় রায়
৩০) অরবিন্দ ঘোষ
৩১) অশোক ব্যানার্জী
৩২) হেমন্ত সরকার
৩৩) সত্য চ্যাটার্জী
৩৪) জয়দীপ চক্রবর্তী
৩৫) জনার্দন চ্যাটার্জী
৩৬) সুব্রত পাল
৩৭) সুভাষ বাউরী
৩৮) তপন পাল
৩৯) সুবল রুইদাস
৪০) নোয়াম আফসার খান
৪১) অনুপ মিত্র
৪২) দেবানন্দ প্রসাদ
৪৩) পরেশ মণ্ডল
৪৪) মোনো সরেন
৪৫) বন্দনা মণ্ডল
৪৬) জাহানারা খান
৪৭) শিপ্রা মুখার্জী
৪৮) মৈত্রেয়ী দাস
৪৯) কৃষ্ণা দাশগুপ্ত
৫০) দেবোমিতা সরকার

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ধর্ম ও সমাজ

—প্রথম পাতার পর

১৮৯৭) তাই তিনি লিখেছিলেন, ''ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন।'' (৭/৩৮২)

বিবেকানন্দ অবশ্যই একজন রাজনৈতিক চিন্তক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর ধর্মভাবনা ও সমাজভাবনারই আবশ্যিক সম্প্রসারণ ঘটেছে রাজনীতির ক্ষেত্রে। ভারতীয় জাত-ব্যবস্থায় যারা সবচেয়ে নিচু জাত তথা শূদ্র, অর্থনৈতিক বিচারে তারাই সমাজের সবচেয়ে গরিব শ্রেণি। তাই ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সামাজিক স্তরবিন্যাসে যেমন, সমাজের সবচেয়ে গরিব অর্থনৈতিক শ্রেণি হিসাবেও তেমন তারা চূড়ান্ত শোষণের শিকার। পৃথিবীর সমস্ত দেশের নিম্নবর্গের মানুষকেই এই অর্থে তিনি 'শূদ্র' হিসাবে অভিহিত করেন। স্বভাবতই, শুধু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতেই অর্থনৈতিক শোষণ থেকে এই শোষিত শ্রেণির মুক্তির প্রশ্নটি তাই অর্থনীতির উপর রাজনৈতিক প্রভুত্বের যে স্থিত ব্যবস্থা তার পরিবর্তনের প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়। এই পরিবর্তনেরই অনিবার্যতা ঘোষণা করে বিবেকানন্দ বলেন, ''এমন দিন আসবে যখন শূদ্র শ্রেণির শূদ্রত্ব নিয়েই উত্থান ঘটবে। শূদ্রগণ শূদ্রগত স্বাভাবিক প্রকৃতি ও আচার নিয়েই প্রত্যেক দেশের পূর্ণ প্রভুত্ব গ্রহণ করবে।'' (৪/৪০১) অর্থাৎ ''বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোশ্যালিজম্, এনার্জিকম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।'' (৬/২৪১) এই দৃষ্টিভঙ্গির বিচারেই ভারতে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের পুরোধা প্রচারক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অগ্রজ বিবেকানন্দকে ভারতের প্রথম সোসালিস্ট হিসাবে অভিহিত করেছেন।

* উদ্ধৃতি—খণ্ড/পৃষ্ঠা, বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা), প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৯

বাড়ি তলিয়ে গেল নদীগর্ভে

—প্রথম পাতার পর

সময় বাড়িগুলি নদীগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে। এখানকার বাসিন্দাদের অধিকাংশই তন্তুবায়। তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে অসহায় দৌড়াদৌড়ি করছেন। বিষয়টি পূর্বস্থলীর ২নং বিডিও বা পূর্ব বর্ধমান জেলা সেচ দপ্তরে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা বিগত ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে বর্ষায় সংশ্লিষ্ট এলাকার ১২টি বাড়ি নদীভাঙনের শিকার হয়েছিল সেই পরিবারগুলিও আজ পর্যন্ত কোনও সরকারি সাহায্য পায়নি। বাধ্য হয়ে পরিবারগুলি নদীবাঁধ এলাকা থেকে ঘরবাড়ির যাবতীয় স্থাবর সামগ্রী ইট-কাঠ-দরজা-জানালা, তাঁতযন্ত্র ইত্যাদি জিনিস যতটা পারছেন নিজেরাই অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছেন। এদিন বাসুদেব সরকার, বানেশ্বর সরকার বললেন, বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কিছু হচ্ছে না। চোখের সামনে সব নদীরজলে সম্পূর্ণ বিলীন হচ্ছে। কাজকর্ম ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা আর হা-হুতাশে চোখের জল ফেলা ছাড়া কিচ্ছু করার নেই। কুমার কীর্তনীয়া, চরণ কীর্তনীয়া, রবীন্দ্রনাথ সরকার, গঙ্গাধর সরকার, তারক সরকার, বিমল কুণ্ডু, শ্রীবাস কুণ্ডু, শংকর কুণ্ডু, ভবানন্দ কীর্তনীয়া, রাম প্রামানিক, বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, সুব্রত কুণ্ডু প্রমুখের বাড়ি নদীগর্ভে সম্পূর্ণ বিলীন হয়েছে। স্বপন সরকার এদিন বললেন, চার মাস আগে বর্ষার সময় ভাঙন হয়েছিল। এখন তো বর্ষা নয়, এই অসময়ে ভাঙন সেচ দপ্তরের অবৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার জন্য। আমাদের এই অবস্থার জন্য সেচ দপ্তর-ই দায়ী। চরণ কীর্তনীয়া বললেন, তাঁর বাড়ির সামনে দুটি বিদ্যুতের খুঁটি ছিল বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিও নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। মহাদেব সরকার বললেন, বারবার বলা সত্বেও মাজিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের ঝর্ণা বিবি বা পশ্চিম তামাঘাট গ্রামসংসদের ২নং সংসদ সদস্য কেউ একবারের জন্যও ভাঙনের শিকার অসহায় পরিবারগুলিকে দেখে যাওয়ার প্রয়োজনবোধ করেননি। পূর্বস্থলীর ২নং ব্লকের বিডিও সোমনা দে একবার ঘুরে গেছেন। বাসিন্দা বা গ্রামবাসীদের সঙ্গে তিনিও কোনো কথা বলার প্রয়োজনবোধ করেননি। এই শীতে পুনর্বাসন বা কোন সাহায্য প্রতিশ্রুতি কিছুই নেই। স্থানীয় বিধায়ক প্রদীপকুমার সাহা এদিন ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। সংবাদ প্রতিনিধিদের তিনি জানান, ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে সরকারি সাহায্য পান, এঁদের পুনর্বাসনের দাবিগুলি নিয়ে তিনি সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবেন। গোটা তামাঘাট গ্রামের বাসিন্দারা এখন আতঙ্কগ্রস্ত।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. বিশ্ব পরিবার দিবস, বিশ্ব শান্তি দিবস। ২. বিশ্ব জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ দিবস। ৩. বিশ্ব সম্মোহন দিবস। ৪. যুদ্ধে অনাথ শিশুদের জন্য বিশ্বদিবস। ৫. ৭ জানুয়ারি। ৬. জানুয়ারি মাসের তৃতীয় রবিবার। ৭. অস্ট্রেলিয়া, ক্যামেরুন, চেক প্রজাতন্ত্র, ব্রুনেই, সামোয়া, স্লোভাকিয়া, সুদান এবং হাইতি। ৮. ১৩৯৯ সালের ১ জানুয়ারি, আমির তাইমুর গুবর্গা, মৃত্যু ১৯.০২.১৪০৫। ৯. ১৯০৬ সালের ১ জানুয়ারি। ১০. ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি। ১১. ফিদেল কাস্ত্রোও চে গুয়েভারার নেতৃত্বে, ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি। ১২.১৯২৫ সালের ১ জানুয়ারি 'দ্য ম্যাসেজ অব ইন্ডিয়া' রাখা হয়।

ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়েছে

—প্রথম পাতার পর

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তখন বিশেষ সি বি আই বিচারক পট্টভি রামা রাওকে রেড্ডি ভাইদের খনি কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার দায়ে সাসপেণ্ড করেন।

স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ছাড়া গণতন্ত্র টেঁকে না— এ বক্তব্য শুধু তাঁদের নয়, গণতন্ত্রপ্রিয় সমগ্র দেশবাসীর। প্রধান বিচারপতির উদ্দেশ্যে লেখা তাঁদের ক্ষোভের চিঠিও চার বিচারপতি সংবাদমাধ্যমকে দিয়েছেন। এঁদের বক্তব্য দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলিও এমন বেঞ্চে পাঠানো হচ্ছে যা অনভিপ্রেত। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এমন একটি মামলার উল্লেখও করেছেন তাঁরা। সোহরাবুদ্দিন ভুয়ো সংঘর্ষ মামলায় সি বি আই আদালতের বিচারপতি বি এইচ লোয়ার মৃত্যু যে তাঁদের প্রকাশ্য বিদ্রোহের অন্যতম কারণ তাও তাঁরা বলেছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, সোহরাবুদ্দিন মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন বি জে পি সভাপতি অমিত শাহ। গুজরাটের এই ভুয়ো সংঘর্ষ মামলার বিচারপতি ছিলেন লোয়া। তাঁর মৃত্যু সত্যিই রহস্যজনক কিনা এ প্রশ্নেরও উত্তর মেলেনি। অভিযোগ সোহরাবুদ্দিন মামলায় অভিযুক্তদের ছাড় দিতে বিচারপতি লোয়াকে ১০০ কোটি টাকা উৎকোচের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করার পরে নাগপুরে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন সেখানেই হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু হয়। এর পরে যে বিচারক দায়িত্ব নেন, তিনি অভিযুক্ত অমিত শাহকে বেকসুর খালাস করে দেন। হৃদরোগকে বিচারপতি লোয়ার মৃত্যুর কারণ হিসাবে দেখানো হলেও পরিবারের অভিযোগ, বিচারপতি লোয়ার মৃত্যু অস্বাভাবিক।

এই অভিযোগ সামনে আসার পরে বোম্বে হাইকোর্টে বিচারপতি লোয়ার মৃত্যুর তদন্ত চেয়ে আবেদন জমা পড়ে। সেই মামলা চলতে চলতেই সুপ্রিম কোর্ট এ সংক্রান্ত আরেকটি আবেদন নিয়ে শুনানি শুরু করেছে। একটি নির্দিষ্ট বেঞ্চে সেই মামলা পাঠানোও হয়েছে। উল্লেখ্য যে আগামী ২৩ জানুয়ারি সেই মামলা শুনবে হাইকোর্ট।

বিচারপতিদের কথায় উঠে এসেছে দেশের গণতন্ত্রের বিপদের কথা। অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ আছে বলেই এই ক্ষোভ। সুপ্রিম কোর্টের মতো প্রতিষ্ঠান যার ওপর গোটা দেশের মানুষের ভরসা সেখানেও। এমন অভিযোগ স্বাধীন ভারতে আগে কখনোও ওঠেনি। মোদী সরকারের আমলেই দেশের সর্বত্র উঠেছে এই আওয়াজ। দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে উঠল এখন। মোদী সরকারের আমলে দেখা যাচ্ছে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নীতিনির্ধারক সংস্থা, গণমাধ্যমে সর্বত্র শাসক দল, সঙ্ঘ পরিবার, সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে মুষ্টিমেয় কতগুলি ব্যক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগের রাজনীতি করে চলেছে। ক্ষমতার চাপ ক্রমশ বাড়ছে, ইঙ্গিত মিললো দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়েও। এখন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র বিচারপতিদের এই আচরণ ঠিক না বেঠিক এ নিয়ে বিতর্ক চলবে। এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অবশ্য তাঁরা যা করেছেন নীরবে করেছেন, ঝুলি থেকে যে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে।

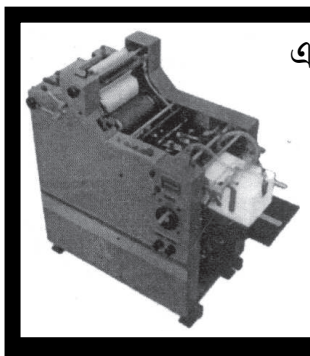

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

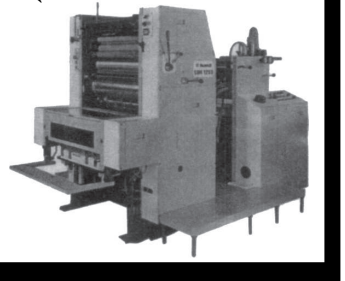

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা